নাগরিক সমাজ : সীমা এবং সীমাবদ্ধতা

সিদ্ধার্থ গুপ্ত

(ক)

প্রেক্ষিত:

ইতিহাস এর পাতা উল্টে দেখতে চাইছিলাম, আজকের এই বহুচর্চিত, বহু উল্লিখিত নাগরিক সমাজ বা সুশীল সমাজের উৎস কোথায়। বিশেষত, ২০০৬ সাল পরবর্তী সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম এবং রিজুয়ানুর রহমান হত্যাকাণ্ড (শব্দটি সচেতনভাবেই লিখলাম, উচ্চ আদালতের সাম্প্রতিকতম রায়ের প্রেক্ষিতে) কে কেন্দ্র করে এই প্রদেশের রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি তুমুলভাবে আলোড়িত হওয়ার সঙ্গে সুশীলসমাজ নামটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে গেছে। স্বীকার করতে বাধা নেই যে ঐ সময়ের পূর্বে এই শব্দবন্ধটি আমারও খুব ভালোভাবে শোনা ছিল না। অথচ আজ আ-দার্জিলিং-সুন্দরবন শিক্ষিত (প্রথাগত শিক্ষার কথাই বলছি) বঙ্গবাসী মাত্রেই বোধকরি এ বিষয়ে অস্পষ্ট হলেও একটি ধারণা পোষণ করেন। বৈদ্যুতিন ও মুদ্রিত মাধ্যমের কল্যাণে সুশীল বা নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি ভাবলেই চোখে ভেসে ওঠে কিছু নাট্যকার, নাট্যনির্দেশক, চিত্রশিল্পী, কণ্ঠশিল্পী বা শিল্পী যশোপ্রার্থীর বিদগ্ধ মুখমণ্ডল। এঁদের কয়েকজনের গুম্ফ শ্রশ্রুশোভিত মুখাবয়ব তো দূরদর্শনে বিভিন্ন চ্যানেলের (ক্ষমা করবেন, প্রতিশব্দ জানা নেই) মারফৎ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের চেয়েও পরিচিত হয়ে উঠেছে। এই নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিত্বকারীদের মধ্যে সংখ্যায় অগ্রগণ্য নাট্যজগতের ব্যক্তিত্বরা—যাঁদের অনেকেই দীর্ঘদিন স্বীয় সৃষ্টিতে ক্ষান্তি দিয়ে, সান্ধ্যকালীন নাট্যচর্চায় অবসর নিয়ে, বৈদ্যুতিন মাধ্যমে রাজনৈতিক বিতর্কে কালাতিপাত করেছেন। সাম্প্রতিককালে উল্লম্বভাবে দলীয় রাজনৈতিক বিভাজনের ফলে (এ প্রসঙ্গে আবার পরে আসা যাবে) তাঁদের কর্মব্যস্ততা অর্থাৎ ঐ মাধ্যমগুলি আয়োজিত বিতর্কে মতামত প্রকাশের দায়দায়িত্ব, বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। নট ও নাট্যকারদের পরেই রয়েছেন চিত্রশিল্পীদের বিশাল বাহিনী, যাঁরা রঙ-তুলি-ইজেলের জগৎকে রাজ্যের এই ক্রান্তিকালে বোধকরি সাময়িকভাবে বিদায় জানিয়ে সমস্ত বিষয়েই নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করে চলেছেন। বরং পিছিয়ে আছেন লেখক ও সাহিত্যিকরা— যাঁরা কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই এই রঙ্গময় বঙ্গদেশে বুদ্ধিজীবীদের অগ্রগণ্য এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জনতার কণ্ঠস্বর বলে পরিগণিত হয়েছেন। বরিষ্ঠ বিদ্বৎজন বা বিশিষ্টজনদের চারপাশে উপগ্রহপুঞ্জের মত বিরাজমান যশোপ্রার্থীর দল। বিতর্কসভায় আহূত হওয়াকেই যাঁরা উন্নতির সোপন করতে চান। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, নাগরিক সমাজের এই বিপুল আয়োজনে উল্লেখযোগ্য ভাবে অনুপস্থিত চিকিৎসক, শিক্ষক ও অধ্যাপক, সরকারি ও বেসরকারি কর্মীরা, বাস্তুকার, আইনজীবী, আর্থিক নানা পেশায় যুক্ত মানুষেরা (অর্থনীতিবিদরা ব্যতিক্রম), ব্যাঙ্ককর্মী, বিপনণকর্মী, সেবামূলক (Service Sector) কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত বা অন্যান্য পেশাজীবীরা। সংবাদমাধ্যমের বিচারে এঁরা হয়তো দেশের রাজনীতি-অর্থনীতি বিষয়ে মতামত দেবার যোগ্য নন।

(খ)

''তোমার স্বদেশ লুঠ হয়ে যায়...''

প্রশ্নটা হল এই নাগরিক সমাজের গুরুত্ব এবং প্রভাব কতোখানি? দেশের ভবিষ্যতের নিয়ন্তা রাজনীতিবিদরা এবং অবশ্যই আমলাকূল। রাজনীতিবিদরা, মন্ত্রী বা আইনসভার সদস্যরা যাতায়াত করলেও, আমলাতন্ত্র 'ন তুয়া আদি অবসানা'। কিন্তু সবকিছুরই নেপথ্যে আছেন ভারতবর্ষের অতি শক্তিশালী বনিকশক্তি, দেশী ও বিদেশী একচেটিয়া পুঁজির মালিক বা প্রতিনিধিরা, বৃহৎ কৃষিজীবী, সামন্ত্রতন্ত্রের ক্ষয়প্রাপ্ত কিন্তু শক্তিশালী অংশ। জমিদারতন্ত্র খাতায় কলমে বিলোপ পেলেও তার শিকড় দেশের গভীরে প্রোথিত। এঁদেরই উন্নয়নের স্বার্থে সিঙ্গুরের হাজার একর জমি ব্যক্তিমালিকের লালসার যূপকাষ্ঠে বলিদান দেওয়া হয়, নন্দীগ্রামের জীবন ও জীবিকা থেকে উচ্ছেদ ঠেকাতে বহু মানুষ শহীদ হন।। ১৪ মার্চ ও ৮ নভেম্বর থেকে চুঁইয়ে আসা রক্ত ভিজিয়ে দেয় পশ্চিমবাংলার মানচিত্রকে। এদেরে স্বার্থেই উদ্যোগ চলে নয়াচর, হরিপুর, কাটোয়া, অন্ডাল, কলিঙ্গনগর, জগৎসিংপুর, নবি মুম্বাই, লালগড় বা দান্ডেওয়াড়ার ভয়াবহ উচ্ছেদ, হত্যা, অত্যাচার এবং গান্ধীবাদী নেতা হিমাংশুকুমার এবং প্রখ্যাত লেখিকা অরুন্ধতী রায় তথ্যপ্রমাণ সহযোগে দেখিয়েছেন, কেবলমাত্র দেশী-বিদেশী খনি কোম্পানিগুলির উদরপূর্তির জন্য উড়িষ্যা বা ছত্তিশগড়ে যেসব চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, তাতে উচ্ছেদের মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন পাঁচলক্ষ আদিবাসী, ইতোমধ্যেই 'সবুজ শিকার' বা গ্রীনহান্টের বলি হয়েছেন ৬৪৪ টি গ্রামের তিন লক্ষের বেশী মানুষ। গ্রামগুলি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করা হয়েছে, মানুষদের মধ্যে যারা বেঁচে আছেন তাঁদের স্থান হয়েছে নারকীয় পুনর্বাসন শিবিরে। পস্কো কোম্পানির দানবীয় ইস্পাত কারখানা এবং বন্দরের স্বার্থে ঢিনঢিয়া নুয়াগাঁ ও গড়াগুজঙ্গ—এই তিনটি গ্রাম সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জনগণের করের অর্থে প্রতিপালিত আরক্ষাবাহিনী অনুপ্রবেশ করছে, হত্যা ও অত্যাচারকে হাতিয়ার করে। কলিঙ্গনগরে গ্রামে গ্রামে বুলডোজার প্রবেশ করছে, একঘন্টা সময়সীমার মধ্যে ধ্বংস করে দিচ্ছে আজন্মলালিত বাসভূমি, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসা পিতৃপুরুষের স্মৃতিবিজড়িত আবাসস্থল। কেননা ঐ জমি মহামান্য রতন টাটার প্রয়োজন, ঐ ভূসম্পদ লুণ্ঠনসঞ্জাত অর্থে তিনি বিদেশে কোরাস বা জাগুয়ার ক্রয়

করবেন। সাইপ্রাস বা বাহামা দ্বীপে অর্থ বিনিয়োগ করবেন ফাটকা পুঁজিতে।

দুদিন আগে পর্যন্ত মহান জাতীয়তাবাদী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তথা মাওবাদী 'কাপুরুষ'দের বিরুদ্ধে ধর্মযোদ্ধা শ্রী চিদাম্বরম যে সংস্থার নির্দেশক (ডিরেক্টর) ছিলেন, আজও তাঁর স্ত্রী যে সংস্থার অংশীদার সেই বেদান্ত কর্পোরেশনকে উড়িষ্যার নিয়মগিরি পাহাড় সরকার দাতব্য করেছেন বক্সাইট উত্তোলন করে অ্যালুমিনিয়াম বানিয়ে বিদেশে পাচার করতে। বাউলাডিলার যে খনিজলৌহের বাজারি দাম টনপ্রতি প্রায় ছয় হাজার টাকা, তা টনপ্রতি ২৭ টাকা দরে জাপানি কোম্পানি স্বভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে (সূত্র: কমরেডদের সঙ্গে পথচলা: অরুন্ধতী রায়)।

উড়িষ্যাতেই পুরীর সন্নিকটে ঐ কুখ্যাত বেদান্ত পেয়েছে ৫০০০ একরের অধিক জমি, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পৃথিবীতে সর্ববৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় সম্ভবতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'কর্নেল ইউনিভার্সিটি' যার পরিসর ৮০০ একর মতো।

সারা ভারতবর্ষ ধরে চলেছে নয়া উদারনীতিবাদী শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় ভূসম্পদ হরণ, উচ্ছেদ, খনি-পর্বত-নদীর মতো প্রাকৃতিক সম্পদকে সরাসরি বিক্রি করে দেওয়া, নিজেদেরই সৃষ্ট আইনকে পদদলিত করে, অরণ্যের অধিকারকে অগ্রাহ্য করে, বনভূমি ধ্বংস করে কারখানা স্থাপনের মহাযজ্ঞ, উপকূলবর্তী লক্ষ লক্ষ মৎস্যজীবীকে বিপর্যস্ত করে 'উপকূলভূমি নিয়ন্ত্রণ আইন', সমগ্র ইউরোপ সহ উন্নত দেশে বাতিল হয়ে যাওয়া বিপদজনক পরমাণু চুল্লিগুলি ভারতবর্ষে স্থাপনের ভয়াবহ পরিকল্পনা এবং তার উপযোগী পরমাণূ দূর্ঘটনা সংক্রান্ত দায়দায়িত্ব বিল (Nuclear Civil Liability Bill) আইনসভায় পাশ করিয়ে নেওয়া। সরাসরি হিংস্র আক্রমণের পাশাপাশি এসেছে 'বিশেষ আর্থিক অঞ্চল' আইন, বুনিয়াদী ক্ষেত্রেও পুরোপুরি বিদেশী লগ্নি আইন, ১০টি লাভদায়ী সরকারী সংস্থাকে বিলগ্নীকরণের প্রস্তুতি, দেশের শ্রম আইন ও ঠিকা শ্রমিক আইন পরিবর্তিত করা, শিক্ষা বিল ও বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিল। খুচরো ব্যবসায় ওয়ালমার্ট, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে আর্চার ড্যানিয়েল মিডল্যান্ড প্রভৃতি সব বহুজাতিক দানবদের একচেটিয়া ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত বাতাবরণ সৃষ্টি করা হয়েছে সযত্নে। অপেক্ষা করেছে কৃষকের বীজ সংরক্ষণ ও ব্যবহারের অধিকার কেড়ে নেবার জন্য বীজ আইন, অপেক্ষা করছে জৈব প্রযুক্তি ও বংশানু পরিবর্তিত ফসলকে বৈধতা দেবার জন্য জৈবপ্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণ অধিকার বিল। এসবের ফলে ভারতবর্ষের পাঁচ হাজার বছরের কৃষিজ্ঞান ও তার প্রয়োগ ধ্বংস হয়ে এই শস্যশ্যামলা দেশ ও তার ৭০ কোটি কৃষক মনস্যান্টো, সিনডোন্ট্রা প্রভৃতি পাঁচ ছটি আন্তর্জাতিক কৃষিপণ্য ও বীজ ব্যবসায়ী মহাদানবের কুক্ষিগত হবে বরাবরের মতো। দেশী প্রযুক্তি, দেশীয় প্রজাতি, দেশীয় পদ্ধতি লুপ্ত হবে—বিটি তুলো, চাল, বেগুন, ক্যানোলা, টমেটো, সয়াবীন, আলু, চা, পালংশাক-এ ভরে যাবে দেশ। বিদর্ভ বা অন্ধের কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল ছেড়ে কৃষকজনের মৃত্যুর মিছিল ছড়িয়ে পড়বে সমগ্র দেশে। অনাহার ও বুভুক্ষায় ভারতবর্ষের বিস্তির্ণ অঞ্চল সাহারা নিম্নবর্তী আফ্রিকার চেহারা ধারণা করবে। দুহাজর সালে অটলবিহারী নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক মোর্চা (এন ডি এ) সরকার দস্তকৎ করেছিল 'ভারত মার্কিন নীতিগত অংশীদারিত্ব' -এর ঘোষণাপত্রে। ২০০৫ সালের ১৮ জুলাই বিশ্বব্যাঙ্কের প্রাক্তন কর্মী (বর্তমানেও সম্ভবতঃ অবসরকালীন ভাতাভোগী) প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সংযুক্ত প্রগতিশীল মোর্চা সরকার স্বাক্ষর দিলেন 'ভারতমার্কিন কৃষিজ্ঞান উদ্যোগ' (Indo US A.K.I) চুক্তিতে—যা আপাতভাবে মখমলের দানা। অথচ এর আড়ালে লুকিয়ে আছে ভারতবর্ষের কৃষিক্ষেত্র, কৃষিপণ্য, জলসম্পদ প্রভৃতির একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে জ্ঞান আদানপ্রদান, গবেষণা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের নামে ভয়াল সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা। তারই সূত্র ধরে পরমাণু চুক্তি, জৈব প্রযুক্তি বিল, শিক্ষা বিল, প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ, চুক্তি চাষ, বিটি বেগুন, মেট্রো ক্যাশ অ্যান্ড ক্যারি, ওয়ালমার্ট, সেজ, এরিট্রোপোলিস, স্বাস্থ্যনগরী, কলিঙ্গনগর, লালাগড় ও দান্ডেওয়াড়ার উচ্ছেদ। এরই সাথে একসূত্রে গাঁথা গ্রাম ও শহরের ছিন্নবিচ্ছিন্ন মানুষ, উচ্ছেদ হওয়া কৃষক, ছাঁটাই হওয়া শ্রমিক, অত্যাচারের বিরুদ্ধে আইনি প্রতিবাদ করা মানবাধিকার কর্মী বা দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে হিংস্র বর্বর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেওয়া 'মাওবাদী'দের দমন করতে, পিষে ফেলতে, খণ্ডবিখণ্ড করে ফেলতে চালু হওয়া নিবর্তনমূলক আটক আইন 'ইউ-এ-পি-এ'— যার ধারা-উপধারাগুলি ব্রিটিশ আমলের রাউলাট আইনের চেয়েও অন্ধকারময়। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক দেশব্যাপী ৫৭ টি সংগঠনকে তালিকাভূক্ত করেছেন মাওবাদীদের সহযোগী বলে। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদীদের তালিকায় মাওবাদী সংগঠনও রয়েছে।

এককথায় বলতে গেলে, ইউ.পি.এ সরকারের বিগত ছয় বছরে দেশের চার পঞ্চমাংশ দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের উপর (অর্জুন সেনগুপ্ত কমিটির রিপোর্ট অনুসারে দেশের ৭৭ শতাংশ মানুষের আয় দৈনিক ২০ টাকার নীচে, সুরেশ তেন্ডুলকর কমিটির হিসাবে প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে অর্থাৎ দৈনিক আয় ১৫ টাকার কম) যে ভয়াবহ আক্রমণ নামিয়ে এনেছে এই উপমহাদেশে গত পাঁচ হাজার বছরের সভ্যতার ইতিহাসে তা অভূতপূর্ব। শাসকদের পক্ষে সুবিধা হত, যদি সাড়ে ৩৪ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এই বিশাল দেশে রাতারাতি ৯০ কোটি মানুষকে উধাও করে দেওয়া যেত। তাহলে মাত্র ২০-২৫ কোটি উচ্চবিত্ত প্রোজ্জ্বল ভারতবর্ষের অধিবাসী হয়ে বাস করতে পারতেন। তা সম্ভব নয় বলে শাসকেরা চাইছেন লাগাতার আক্রমণে ঐ ৯০ কোটি মানুষকে ভারবাহী পশুতে পরিণত করতে— যারা বিনা প্রশ্নে একচেটিয়া পুঁজির জোয়ালে শ্রম দেবে, কোনোক্রমে জীবনধারণ করবে এবং উৎপাদন করবে বিপুল পরিমাণ 'উদ্বৃত্ত মূল্য' (surplus value)। কবির ভাষায় ''শব থেকে উৎসারিত

স্বর্ণের বিস্ময়!”

(গ)

ডাক উঠেছে বারে বারে তুমি সাড়া দাও কী...

ইংরাজি শব্দকোষ বলছে নাগরিক সমাজ হল রাষ্ট্র, পরিবার ও বাজারের পরিধির বাইরে, সমষ্টিগত স্বার্থ, উদ্দেশ্য ও মূল্যবোধের নিরিখে এবং স্বেচ্ছা অংশগ্রহণের মাধ্যমে গড়ে ওঠা এক সঙ্ঘ (‘Uncoerced colelctive action around shared interests, purpose and value. An instiutional form distinct from state, family and market’)। যদিও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের সাথে নাগরিক সমাজের আন্তসম্পর্ক অস্পষ্ট এবং পরিবর্তনশীল (Blurred and Negotiable)। এইভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন লন্ডনের স্কুল অফ ইকোনমিকস্-এর ‘সেন্টার ফর সিভিল সোসাইটি।

ইতিহাসের পাতায় চোখ রাখলে দেখা যাচ্ছে ‘‘Societas civilis” (Cicero) ব্যবহার করেন রোমান সাম্রাজ্যের সময়। ‘সিভিল সোসাইটি’ বলতে তখন বোঝানো হয়েছিল ‘ভালো’ (ভদ্র বা সুশীল) সমাজের প্রতিকল্প। সক্রেটিসের মত ছিল সমাজের যে কোনো দ্বন্দ্ব গণবিতর্ক ও যুক্তির আদানপ্রাদান দ্বারা মেটানো সম্ভব। প্লেটো মনে করতেন, আদর্শ রাষ্ট্র একটি সমাজই যাতে সমস্ত নাগরিকরাই তাদের নিজ নিজ সক্ষমতা অনুযায়ী অংশগ্রহণ করবে ‘প্রচুরতর মানুষের প্রভূততর সুখসাধনের লক্ষ্যে’। অ্যারিস্টটল বলেছিলেন নাগরিক সমাজ হল নাগরিকদের শাসন করা এবং শাসিত হবার বিষয়ে আদনপ্রদানের প্রকৃষ্ট মঞ্চ।

মধ্যযুগে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব নাগরিক সমাজের ধারণা ও গুরুত্বকে কার্যত অপ্রাসঙ্গিক করে দেয়। ইউরোপের ত্রিশ বছরের যুদ্ধ ও ‘ওয়েস্টফিলিয়া চুক্তি’ সার্বভৌম রাষ্ট্রের ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার ধারণা সৃষ্টি করে। গড়ে উঠে জাতিভিত্তিক সাম্রাজ্য, জাতীয় সেনাদল, আমলাতন্ত্র ও অর্থদপ্তর। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যপাদ অবধি ইউরোপের এই অবস্থাই প্রচলিত ছিল।

ইউরোপের নবজাগরণ বা রেনেসাঁ (এবং তার পাশাপাশি ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব) এতদকাল ধরে প্রচলিত আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল ধরে নাড়া ছিল। ‘‘বংশানুক্রমিক অধিকার কোন বৈধতা দেয়?”, ‘‘সরকারের প্রয়োজন কি?”, ‘‘কেন কিছু মানুষের বুনিয়াদী অধিকার অন্য অনেকের চেয়ে অধিক হবে?” —এইসব তীক্ষ্ণ প্রশ্ন মনোজগতে তীব্র উপপ্লবের সৃষ্টি করল। বিরোধিতা শুরু হল রাষ্ট্র ও গির্জার যোগসাজশের বিরুদ্ধে, প্রতিবাদ ধ্বনিত হল অত্যাচারের অস্ত্র হিসাবে এই দুই প্রতিষ্ঠানের ভূমিকার বিরুদ্ধে, প্রত্যয় ঘোষিত হল ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের সপক্ষে। টমাস হবস্ এবং জন লক নাগরিক সমাজ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁদের মতে মানুষদের সঙ্গে মানুষের স্বার্থের সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণে রাখতে গেলে একটি শক্তিশালী সংস্থার প্রয়োজন। সেই সংস্থা হল রাষ্ট্র। কিন্তু ব্যক্তিজীবনের উপর রাষ্ট্রের প্রভুত্বকামী ভূমিকার রক্ষাকবচ হিসাবে তাঁরা রাষ্ট্রের সাথে নাগরিকের চুক্তির কথাও বলেছেন। যুদ্ধদীর্ণ ইউরোপে, তাঁরা চেয়েছিলেন মানুষ জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি সহ শান্তিতে কালাতিপাত করুক। তাই একদিকে প্রয়োজন শক্তিশালী রাষ্ট্র অন্যদিকে মানুষে মানুষে সুসম্পর্কের জন্য এবং রাষ্ট্রের সর্বগ্রাসী আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে ‘সুশীল সমাজ’।

১৯৭৫ এর আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ও ১৭৮৯ এর ফরাসি বিপ্লবের অভিঘাত পাল্টে দিল সুশীল সমাজের ধারণাকে।

জি.জিব্লু.এফ হেগেল বললেন নাগরিক সমাজ ব্যক্তিস্বার্থ এবং সম্পত্তির অধিকারের রক্ষার প্রশ্নে একটি অ-রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান। তবে এর আভ্যন্তরীণ (পুঁদিবাদী) দ্বন্দ্বের নিরসনে রাষ্ট্রের নজরদারী ও হস্তক্ষেপের প্রয়োজন। কিন্তু আমেরিকা ও ফরাসি দেশের গণজাগরণের অভিজ্ঞতা দেখে আলেক্সিস ডি টকভেলি (Alexis de Tocqueville) বললেন কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র এবং স্বাধীন ব্যক্তিত্বদের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার জন্যই নাগরিকসমাজ।

কার্ল মার্ক্স মনে করতেন নাগরিক সমাজ হল উৎপাদনের শক্তিগুলি ও সামাজিক সম্পর্কগুলির আন্তঃসম্পর্কের ভিত্তি, আর রাষ্ট্র হল তার উপরিসৌধ। ভিত্তি এবং উপরিসৌধ উভয়েই বুর্জোয়াদের স্বার্থরক্ষাকারী এবং একই বুর্জোয়াশ্রেণীর দুই হাত। ফলে উভয়েরই বিলোপসাধন প্রয়োজন সর্বহারার স্বার্থে।

আন্তনিও গ্রামসি ভিন্ন মত পোষণ করতেন। তাঁর মতে নারিক সমাজ রাষ্ট্রের আধিপত্যবাদের বিরোধিতায় উপযোগী ভূমিকা নিতে পারে। অ-মার্ক্সবাদী বামপন্থীরা মনে করেন নাগরিক সমাজ রাষ্ট্র ও বাজারের আক্রমণের বিপ্রতীপে জনগণের ইচ্ছাকে প্রতিফলিত করে, রাষ্ট্রকে প্রভাবিত করতে পারে। অপরপক্ষে নয়া উদারনীতিবাদীরা মনে করেন নাগরিক সমাজ সাম্যবাদ এবং তার কর্তৃত্ববাদী শাসনকে ঠেকাবার একটা প্রধান হাতিয়ার। অর্থাৎ তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও মার্ক্স এর অভিমতকেই সমর্থণ করেন।

ফলে দেখা যাচ্ছে কি নয়া বামপন্থী, কি নয়া উদারনীতিবাদী— সকলের কাছেই ‘সুশীল সমাজের’ গুরুত্ব অপরিসীম। রাজ্যের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত বামপন্থীরা (!) যতই ‘সুশীলবাবু’বলে ঐ সমাজের নেতৃস্থানীয়দের বিদ্রূপ করুন না কেন!

পশ্চিমবঙ্গীয় বামপন্থীদের (!) 'সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম-রিজওয়ানুর' উত্তর নাগরিক সমজ নিয়ে সুতীব্র সন্দেহপ্রবণ হওয়ার অবশ্য ভিত্তি আছে। আশির দশক থেকেই অধুনালুপ্ত পূর্ব ইউরোপীয় সোভিয়েত ব্লকে পশ্চিমী ধনতন্ত্র 'কমিউনিজম'কে সংহার করার জন্য সরাসরি কোনো রাজনৈতিক সংগঠন না পেয়ে, নাগরিক সমাজকে মদত দিতে ও ব্যবহার করতে থাকে। যদিও এইসব দেশে যে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিল তা হচ্ছে সমাজবাদের পরিবর্তে সংশোধনবাদ, রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ ও দলীয় আমলাতন্ত্র— যার ক্ষুদ্র প্রতিরূপ আজ পশ্চিমবঙ্গে বিরাজমান। এক অর্থে পোল্যান্ডে লচ্ ওয়ালেচার 'সলিডারিটি'কেও এই ধরণের নাগরিক সংগঠনই ধরা যায়। এবং এই ধরণের সংগঠনগুলি— নানা বিদ্ধৎসভা, সেবামূলক সংস্থা, কর্মী গোষ্ঠী (activist group), পরিবেশবাদী ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী প্রভৃতি (যাদের অনেকের পিছনেই হয়ত প্রত্যক্ষ আর্থিক ও অন্যান্য মদত ছিল) কমিউনিস্ট শাসনের চূড়ান্ত অবসানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। আজ মহাশ্বেতা দেবী, বিভাস চক্রবর্তী, সুজাত ভদ্র, শাঁওলী মিত্র বা শুভাপ্রসন্নদের সিপি (আই) এম সেই চোখেই দেখে। পশ্চিমবঙ্গে একই ঘটনা ঘটবে— তবে তা পূর্ব ইউরোপের এক হাস্যকর প্রতিলিপি। মার্ক্স-এর ভাষায় ''ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি নয়, প্রহসন।''

১৯৯০ এর দশকে বিশ্বায়ন এবং উন্নয়নের বিকল্প মডেলের নির্মাণেও এই নাগরিক সমাজের ভূমিকা প্রকট হয়ে উঠেছিল। ১৯৯০ এর 'ওয়াশিংটন ঐকমত্য' (Washington consensus) দরিদ্র দেশগুলিতে বিশ্বব্যাঙ্ক ও আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের শর্তসাপেক্ষ ঋণ দান এবং কাঠামোগত পুনর্বিন্যাস এর ক্ষেত্রে এর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভূমিকা যথাসম্ভব সংকুচিত করে, নাগরিক সমাজভুক্ত সংস্থাগুলিকে তার স্থানে বসায়। অ-সরকারি তহবিল গ্রহীতা (Funded) সংস্থাগুলি 'নয়া সামাজিক আন্দোলন' (New Social Movement) এর বার্তাবহ হয়ে ওঠে। পরিষেবা ও সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের স্থানে এই ধরণের সংগঠনকে উৎসাহদান নয়া সাম্রাজ্যবাদীদের প্রধানতম কৌশল হয়ে দাঁড়াল। অর্থনীতিবিদ সংগঠনকে উৎসাহদান নয়া সাম্রাজ্যবাদীদের প্রধানতম কৌশল হয়ে দাঁড়ায়। অর্থনীতিবিদ হোয়াইটস (Whaites) বলেন ''Lets get civil society straight, because state is a pre condition of civil society and not the other way round''।

নব্বই দশকের শেষ পাদে প্রতীয়মান হয় যে রাষ্ট্রকে প্রতিস্থাপিত করতে নাগরিক সমাজভুক্ত সংগঠনগুলি ব্যর্থ হয়েছে। বরং বহুক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে বিশ্বায়ণের অশ্বমেধের ঘোড়ার বিরুদ্ধে দাঁড়ানো সংস্থা। রাষ্ট্র এবং বাজারের অন্তর্বর্তী স্থানে তৃতীয় পক্ষ (Third Sector) হিসাবে নাগরিক সমাজের গুরুত্ব আদৌ উপেক্ষণীয় নয়। তবে প্রথম বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলির সাথে অবশ্যই তৃতীয় বিশ্বের আধা সামন্ত্রতান্ত্রিক আধা ঔপনিবেশিক দেশের নাগরিক সমাজের চরিত্রগত প্রভেদ রয়েছে।

(ঘ)

''যে রাতে মোর দুয়ারগুলি...''

পশ্চিমবঙ্গ ও সুশীল সমাজ। এই আলোচনা করেই প্রবন্ধের যতিচিহ্ন টানতে হবে। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে যে সুশীলসমাজ বা নাগরিক সমাজকে আমরা দেখছি, তার বয়স বোধকরি মাত্র সাড়ে তিন বছর। সে সুশীল সমাজ সিঙ্গুরের জমি দখলের সময় চূড়ান্ত দোদুল্যমান ছিল। অবশ্যই নন্দীগ্রাম আন্দোলন বা রিজওয়ানুর রহমান হত্যাকান্ডের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। এবং নিশ্চিতভাবেই লালগড়ের ভূমিপুত্রদের উপর অত্যাচারের ক্ষেত্রে তাঁদের অতলান্তিক নীরবতা আমাদের যন্ত্রণায় বিদ্ধ করেছে। অরাজনৈতিকতা বা আরও সঠিকভাবে বলতে গেলে অ-দলীয় রাজনৈতিকতায় যার জন্ম, যার বৌদ্ধিক উন্নাসিকতা সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম সংগ্রামী প্রধানা বিরোধী জননেত্রীকেও ১৪ নভেম্বর একসাথে মহামিছিলে পা মেলাতে অনুমোদন দেয়নি, সমদূরত্বের ও আপাত নিরপেক্ষতার ছুৎমার্গ যার ঘোষিত নীতি ছিল— সেই সুশীল সমাজে ফাটল ধরল বিগত লোকসভা নির্বাচনের অব্যবহিত আগে। আর চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল ফল প্রকাশের পর। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট শাসনের মেয়াদকাল ৩৩ বছর। এর মধ্যে মরিচঝাঁপি ঘটেছে; চাঁদমণি চা বাগান - বন্দর শ্রমিক - শান্তিপুরের কৃষক - ব্যান্ডেল কোলাঘাটের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ঠিকা কর্মীদের উপর গুলি চলেছে; করন্দা, নানুর, ছোট আঙারিয়া, কেশপুর- গরবেতার গণহত্যা ঘটেছে; বিজনসেতু - অনীতা দেওয়ান - বর্ণালী দত্ত -ভিখারি পাসোয়ান ঘটেছে; বাসট্রাম ভাড়া আন্দোলন - জুনিয়ার ডাক্তার আন্দোলনে লাঠি গুলি চলেছে। প্রায় চল্লিশ হাজার রাজনৈতিক কর্মী ও সাধারণ মানুষ নিহত হয়েছেন প্রধান শাসকদলের হাতে। কিন্তু কেবলমাত্র আংশিকভাবে, কানোরিয়া ছাড়া নিহত মানুষ ও তাদের পরিবারবর্গের পাশে দাঁড়াননি। রাজারহাটে হাজার হাজার কৃষককে উচ্ছেদ করা হয়েছে, খড়গপুর - বর্ধমান-উত্তরবঙ্গে উচ্ছেদ হয়েছে, কলকারখানা - চা বাগান - খেলার মাঠ-জলাভূমি চলে গেছে প্রোমোটারদের গর্ভে। পশ্চিমবঙ্গের বিবেক জাগ্রত হয়নি। বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক, চিত্রকর, নাট্যকাররা তার বিরোধিতায় পথে নামা দূরে থাক তাঁদের সৃষ্টির মাধ্যমগুলিও পুরোপুরি ব্যবহার করেননি। বরং বিভিন্ন নির্বাচনী জনসভায় বামপ্রার্থীদের জয়যুক্ত করার আহ্বান রেখেছে। ব্যক্তিগত আদানপ্রদানের কাহিনি তুলছিই না।

যখন সিঙ্গুরে টাটার সাথে বা শালবনীতে জিন্দালদের সাথে ভূসম্পদ লুণ্ঠনের সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হল, তখনও তারা প্রতিবাদ করা দূরে থাক অনেকেই সমর্থন জানিয়েছিলেন। অবশ্যই বহু ব্যতিক্রম আছে।

ব্যক্তিগতভাবে কাউকে দোষারোপ করা উদ্দেশ্য নয়। যা বলতে চাইছি তা হল, এক শক্তিশালী সাবালক তৃতীয় পক্ষ হিসাবে সুশীল সমাজের তখনও জন্মই হয়নি।

তারপর ঘটল সিঙ্গুর। ঘটল নন্দীগ্রাম। স্মৃতি যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করে, তবে বলি সিঙ্গুরের আন্দোলন কিন্তু রাজনৈতিক কর্মীরাই (অনেকেই নকশালপন্থী) প্রথম থেকে ছিলেন। নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, কলাকুশলী বুদ্ধিজীবীরা বোধহয় তখনও দ্বিধাগ্রস্ত যে সত্যিই ভারতবর্ষের বণিককুলের শিরোভূষণ রতনবাবুর কারখানা হাজার হাজার বেকারকে চাকরি দিয়ে ও কোটি কোটি টাকার অনুসারী শিল্পকে ডেকে এনে পশ্চিমবঙ্গে আর্থিক মানচিত্র বদলে দেবে কিনা, মরা গাঙে বান আসবে কিনা। তাঁরা অনেকেই তর্ক করছিলেন ব্রিটিশ আমলের অধিগ্রহণ আইনে জমি দখল করলে তা কতটুকু অন্যায্য হয়।

কিন্তু এরপর ঘটল ১৪ই মার্চ, ২০০৭-এর নন্দীগ্রাম। ১৪ জন মানুষকে পুলিশের গুলি খেয়ে নিহত হতে দূরদর্শনের পর্দায় মধ্যবিত্ত মানুষ দেখলেন। শুনলেন নিহতদের আত্মীয়, আহত মানুষ, ধর্ষিতাদের আর্তনাদ। বৈদ্যুতিন ও মুদ্রিত মাধ্যমের অনেকগুলি অসাধারণ ভূমিকা পালন করল। সর্বাধিক প্রচারিত সংবাদপত্র ও তাদের বৈদ্যুতিন মাধ্যম আন্দোলনের বিরোধিতা করে প্রায় গণশত্রুতে পরিণত হল। হু হু করে কমে গেলো প্রচার। (নন্দীগ্রামের পরের পর্বে ডিগবাজি খেতে এরা বাধ্য হয়, আর এখন তো দুবেলাই ডিগবাজি দিচ্ছে)। তাপসী মালিকের দগ্ধ দেহ মানুষের ঘৃণা ও ক্রোধকে চরমে নিয়ে গেল। মুখ্যমন্ত্রী সহ প্রধান শাসকদলের কর্তাদের চূড়ান্ত ঔদ্ধত্য, অপরিসীম দম্ভ ও ক্ষমতার প্রকাশ, মানুষের প্রতি তাচ্ছিল্য, লাগাতার মিথ্যাভাষণ এবং জঘন্য কথাবার্তা পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষকে, নাগরিক সমাজকে আরও সংহত আরও প্রত্যয়ী করে তুলল যে আর চুপ করে থাকা যায় না। আর চুপ করে থাকা অপরাধ। এর পরে আমাদের পরিবারবর্গ ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে। আত্মজ, আত্মজারা ভবিষ্যতে কৈফিয়ৎ চাইবে। কেবল সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে গেলে, সম্মান নিয়ে শান্তিতে জীবনধারণ করতে গেলে প্রতিবাদ করতেই হবে। প্রতিরোধ করতেই হবে। প্রত্যাঘাত ছাড়া উপায় নেই।

বাকী ইতিহাস সবাই জানেন। সেসব পুনরুল্লেখ করে পাঠকদের বিরক্তি উৎপাদন করব না। শুধু আর একবার মনে করিয়ে দিই ১৪ নভেম্বর কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলা মহামিছিল। অমন মিছিল পশ্চিমবঙ্গবাসী কোনোদিনও দেখেননি।

রিজওয়ানুর রহমান-এর মৃত্যুতে শাসকদল, তাদের অনুগৃহীত আরক্ষাবাহিনীর উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও টোডিদের যোগাযোগ যত স্পষ্ট হয়েছে, নাগরিক সমাজের নীরব অথচ কঠিন প্রতিবাদ ততই দৃঢ় হয়েছে। বাঙালী মধ্যবিত্তের আজন্মলালিত ধর্মবিশ্বাসকে তুচ্ছ করে প্রতিটি পরিবার হতভাগ্য যুবককের জন্য চোখের জল ফেলেছে, মোমবাতি জ্বেলেছে, স্বাক্ষর করেছে সেন্ট ডেভিয়ার্স কলেজের দেওয়ালে টাঙ্গানো কাপড়ে। মানুষের সেই ক্ষোভ ও ধিক্কারের আগুনে পুড়ে গিয়ে দাম্ভিক মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধত নগরপালকে অপসারিত করতে বাধ্য হয়েছেন, বাধ্য হয়েছেন রিজ-এর মা-এর সামনে নতমস্তকে দাঁড়াতে— যদিও 'ইনসাফ' দেবার প্রতিশ্রুতি তিনি রাখেননি। অবশ্যই এ সকল নাগরিক সমাজের সাফল্য। কিন্তু আমাদের নাগরিক সমাজ সম্ভবতঃ দুর্বলকাণ্ড ব্রততী যা রাজনৈতিক মহীরূহের উপর ছাড়া বাঁচতে পারে না। লোকসভা নির্বাচন এবং তৎপরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে সম্ভবত নাগরিক সমাজ তার নিরপেক্ষতা ও অ-দলীয় রাজনৈতিকতার চরিত্র হারিয়েছে। নাগরিক সমাজের নেতৃবৃন্দ আজ বহুলাংশে প্রধান বিরোধী দলের সাথে সামিল এবং নির্বাচনে তাঁতের জয়যুক্ত করার আহ্বানও রেখেছেন। সুযোগ ছিল 'বৈদিক গ্রাম' নিয়ে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলার। সুযোগ ছিল স্টিফেন কোর্টের মর্মন্তুদ ঘটনায় জনমত জাগ্রত করার। সরাসরি নির্বাচনকেন্দ্রীক রাজনৈতিক কর্মসূচিতে সামিল হওয়া এবং বিশেষ রাজনৈতিক দলকে জয়যুক্ত করার আহ্বান (অতীতে যেমন বারে বারে বামফ্রন্টের পক্ষে আবেদন রাখা হয়েছে)— চিহ্নিত করে যে পক্ষবদল ঘটেছে, মানসিকতা বদল নয়। বলছি না নাগরিক সমাজভূক্ত ব্যক্তিরা নির্বাচনী রাজনীতিতে সামিল হতে পারবেন না। অবশ্যই সে অধিকার এবং সম্ভবতঃ দায়িত্বও ব্যক্তিগতভাবে তাদের আছে। কিন্তু নাগরিক সমাজগতভাবে? অনেক বেশী জরুরী কি ছিল না— এই দেশে লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে মতামত ব্যক্ত করা, ভয়াবহ নানা আইনি বেআইনি পথে সাধারণ মানুষকে উচ্ছেদ ও ধ্বংসের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা? ইউ. এ. পি. এ কালাকানুন বা লালগড়ে মৃত্যুর মিছিলের বিরুদ্ধে ১৪ নভেম্বরের মতই আর একটি সংঘবদ্ধ প্রতিবাদের ডাক দেওয়া।

সিঙ্গুর - নন্দীগ্রামে ঐতিহাসিক ভূমিকা রাখা ব্যক্তিবর্গ আজ ত্রিধা বিভক্ত। প্রধান অংশটি প্রধান বিরোধী দলের পক্ষাবলম্বন করেছেন এবং তাঁদের পুরসভা ও আগামী বিধানসভা নির্বাচনে জয়যুক্ত দেখতে চান। দ্বিতীয় অংশটি নিঃশব্দে ফিরে গেছেন তাঁদের সৃষ্টির জগতে। আর তৃতীয় অংশটি বা ''যে জন আছে মাঝখানে'' বেশ ক্ষুদ্র। তাঁরা বুঝছেন দেশের মানুষের অস্তিত্বের সংকটকে, সাম্রাজ্যবাদের বিপদকে, ভারত মার্কিন চুক্তির ভয়াবহতাকে। কিন্তু তারাও কিছুটা বিভ্রান্ত — সমর্থন বা বিরোধিতার প্রশ্নে। সর্বোপরি তাঁদের ক্ষীণ কণ্ঠস্বর মানুষের কর্ণে সামান্যই প্রবেশ করছে। তাই লালগড় অনেক বেশী ব্যাপ্ত, অনেক বেশী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের ধারক হয়েও নন্দীগ্রাম হয়ে ওঠে না। যাঁরা সভাঘর ভর্তি করে অরুন্ধতী রায়ের বক্তব্য শুনতে আসেন, আপ্লুত হন— সেইসব অনুসারী সহনাগরিকরা আবার ধীরে সুস্থে ফিরে যান নিজস্ব প্রকোষ্ঠে। অরুন্ধতী বা গৌতম নভলাখার সভায় আসা মানুষের ২০শতাংশ ও ইউ এ পি এ বিরোধী বা পস্কো বিরোধী পথসভায় সামিল হন না। মিটিং মিছিলগুলি আর ফিরে যাক প্রাক-নন্দীগ্রাম

কৃশ কলেবরে। নেতৃত্বই যেখানে বিভক্ত, ছিন্নবিচ্ছিন্ন, চূড়ান্ত বহুত্ববাদী— সেখানে অনুগামীদের বিভ্রান্তি অস্বাভাবিক নয়।

মাঝে মাঝে মনে হয় ১৪ নভেম্বরের মিছিল বোধহয় অবাস্তব ছিল। কোথা থেকে এসেছিলেন অত মানুষ? সাধারণ গৃহবধূ থেকে সেক্টর পাঁচ-এর ছোট তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানির মালিক? ক্লাশ পালানো ছাত্র থেকে ক্লাশ ছুটি দেওয়া অধ্যাপক? গুণী বিদ্বৎজন থেকে প্রায় অর্ধশিক্ষিত সামান্য কায়িক শ্রম করে বেঁচে থাকা যুবক? কেন আমাদের সবাইকার মনে হয়েছিল— আজ যেতেই হবে। না গেলে আর মানুষ বলে পরিচয় দেওয়া যাবে না!

কোথায় মিলিয়ে গেলেন তাঁরা? তাঁদের কি আর ফিরে পাওয়া যাবে, যূথবদ্ধতায় চুরমার করে দেওয়া যাবে, শাসকের অত্যাচার ও ঔদ্ধত্যের কারাগারকে? রাজনৈতিক দলগুলির বাইরে নাগরিক সমাজ কি স্বাধীন উদ্যোগ নিয়ে আবার উঠে দাঁড়াতে পারবে?

সে উত্তর নিহিত আছে ভবিষ্যতের গর্ভে। কিন্তু এ কথা তো ১৪ নভেম্বর আমাদের শিক্ষা দিয়েছে যে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ সম্ভব। পরিবর্তন সম্ভব। সম্ভব চার দশকের জগদ্দল পাথরকে ভেঙে ফেলা।

সেটাই নাগরিক সমাজের সাফল্য। অন্তহীন আশার উৎসও সেটাই।